শিক্ষা

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল: বিপর্যয় কিংবা বাস্তবতা

মোশতাক আহমেদ

মোশতাক আহমেদ

প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫ | ০৮:৩২

- অ +

এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলে দেখা যাচ্ছে, গত ২০ বছরের মধ্যে পাসের হার সর্বনিম্ন। প্রাপ্ত তথ্যমতে, এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ১২ লাখ ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪১ দশমিক ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ফেল করেছে, যা সংখ্যার হিসাবে পাঁচ লাখের বেশি। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ হতে না পারার বিষয় ঘিরে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। অনেকেই একে ফল বিপর্যয় হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। বিপর্যয় হঠাৎই ঘটে। কিন্তু আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যা ঘটছে, তা হঠাৎ ঘটা কোনো বিষয় নয়। বলা চলে, এটিই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য।

তবে কোনো পরীক্ষায় ৪১ শতাংশের বেশি পরীক্ষার্থীর ফেল করা একটু অস্বাভাবিক বৈ কি! প্রশ্ন হলো, এই যে পাঁচ লাখ ছাত্রছাত্রী ফেল করল, এর দায় কি শুধুই তাদের? যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে তারা পরীক্ষা দিয়েছিল, সেসব প্রতিষ্ঠানের কি কোনো দায় নেই? এক খবরে দেখেছি, নেত্রকোনা জেলার চারটি কলেজ থেকে কেউই পাস করেনি। জেলার কেন্দুয়া উপজেলার একটি কলেজ থেকে কোনো ছাত্র পরীক্ষায়ই অংশগ্রহণ করেনি। প্রশ্ন হলো, যদি পরীক্ষায় পাঠানোর জন্য কোনো ছাত্রই না থাকে, তাহলে সেই কলেজের শিক্ষকরা কী করেন? এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারের নীতিমালা জনগণের কাছে স্পষ্ট করা দরকার। রংপুরের পীরগাছা উপজেলার কান্দিরহাট স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে মাত্র একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল এবং সেই শিক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি। অথচ কলেজটিতে শিক্ষক রয়েছেন ১২ জন। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এই যে আমরা পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার জন্য ঢালাওভাবে শিক্ষার্থীদের দায়ী করি, এটা কতটুকু যুক্তিসংগত? শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের কি কোনো দায় নেই?

প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র আরও ভয়াবহ। গত ১৩ অক্টোবর একটি পত্রিকায় ময়মনসিংহ জেলার ১৩টি উপজেলার প্রাইমারি শিক্ষার ওপর এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তাতে জানা যায়, জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। ফাঁকা পড়ে থাকছে স্কুলের বেঞ্চ। সেখানে গত পাঁচ বছরে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ১৩ হাজার ৬৮১ শিক্ষার্থী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে।

২০০৯ সালে দেশে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও ২০২২ সালের বৈশ্বিক সৃজনশীল ইনডেক্সে ১৩৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৯তম। ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন প্রকাশিত ২০২১ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে ১৩২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৬ নম্বরে; দক্ষিণ এশিয়ায় যা সবার নিচে। কিছুদিন আগেই দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিং নিয়ে কাজ করে এমন দুটি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। শিক্ষার এই যে অবনমন, তা তো এক দিনে বা এক বছরে ঘটেনি।

অপ্রিয় হলেও সত্য, এটাই যে স্বাধীনতার পর গত ৫৪ বছরে যত সরকার ক্ষমতায় এসেছে তাদের কেউই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। যেটুকু ঘামিয়েছে তা শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝেই সীমাবদ্ধ। আর তার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের করা হয়েছে গিনিপিগ। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ড. কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, যা কুদরাত-এ-খুদা কমিশন নামেই পরিচিতি লাভ করে। দীর্ঘ দুই বছর পর এই কমিশন ১৯৭৪ সালে তার রিপোর্ট প্রদান করে। কিন্তু সেই রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। ধারণা করা হয়, স্রেফ রাজনৈতিক কারণেই তা করা হয়নি। এর পর আরও অন্তত ৬টি কমিশন করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার উন্নয়নে কোনো সরকারই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তার পরিবর্তে তারা শুধু অবকাঠামো নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারও ক্ষমতায় এসে নানা বিষয়ে সংস্কারের জন্য ১১টি কমিশন করেছে। কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়নে কোনো কমিশন করেনি। হতে পারে, আমাদের দেশে যারাই ক্ষমতা কাঠামোর প্রভাব রাখার মতো অবস্থানে থাকেন বা আছেন তাদের অধিকাংশেরই সন্তানরা এ দেশে লেখাপড়া করেন না। সে কারণে হয়তো শিক্ষা নিয়ে ভাবার সময়ও তাদের নেই।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা মোটাদাগে দুটি ধারায় বিভক্ত– শহরভিত্তিক ও গ্রামভিত্তিক। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ও সুবিধাভোগী মানুষ শহরে বাস করেন, আর সুবিধাবঞ্চিতরা গ্রামে। গত দুই-তিন দশকে শহরে গড়ে উঠেছে ব্যাপক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেগুলোতে অন্তত ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার কারণে হলেও কিছুটা লেখাপড়া করানো হয়। অন্যদিকে গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারি সহায়তানির্ভর কিংবা সরকারি হওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়ন নিয়ে শিক্ষকরা মাথা ঘামান না।

এই যে এইচএসসিতে ৫ লাখের বেশি ছাত্রছাত্রী ফেল করেছে, তাদের অধিকাংশই মফস্বল কলেজের ছাত্র। যে প্রাইমারি স্কুলগুলোতে ছাত্র কমে আসছে, সেগুলোও মফস্বল বা গ্রাম এলাকার। সোজা কথায়, শিক্ষাক্ষেত্রে যে বাণিজ্যিকীকরণের ধারা গত কয়েক দশক ধরে চলে আসছে, তার নির্মম শিকার হচ্ছে আমাদের গ্রামভিত্তিক বা মফস্বলের প্রতিষ্ঠানগুলো। তারই প্রভাব গিয়ে পড়ছে শিক্ষার মানে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল সংস্কার। সেই সঙ্গে নানা ধারার নানামুখী শিক্ষার পরিবর্তে গ্রাম-শহরের বৈষম্যবিরোধী একমুখী শিক্ষা চালু করা। আরও যা করণীয়, সঠিক জনমিতিক পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করা যথাযথ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় আনা। তা না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও বিপর্যয়ের জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

মোশতাক আহমেদ: সাবেক জাতিসংঘ কর্মকর্তা ও কলাম লেখক